স্টাডি মেটেরিয়ালস

তৃতীয় সেমেস্টার/ বাংলা সাধারণ (BNGG, 301)

রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়

পুরুষোত্তম সিংহ

পণপ্রথা ও 'দেনাপাওনা' গল্প

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পজীবনের প্রথম পর্বের একটি অন্যতম গল্প হল 'দেনাপাওনা'। এ গল্পের পটভূমিতে রয়েছে পণপ্রথা। বাঙালি বধূর জীবনে পণপ্রথা কত ভয়ংকর হতে পারে তার পরিণাম দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে। বাংলাদেশের এমন কত বধূর মৃত্যু ঘটেছে তার ইয়াত্তা নেই। শুধু মৃত্যু ঘটেছেই না আজও ঘটছে। তাই উনিশ শতকের শেষে লেখা এ গল্প একবিংশ শতকে এসেও সমান প্রাসঙ্গিক।

সাহিত্যকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। লেখক সামাজিক নানা ঘটনা সাহিত্যের আঙিনায় প্রকাশ করবেন এটাই স্বভাবিক। সাহিত্য জীবনের জলছবি বা প্রতিচ্ছবি। সেই কাজটাই করেছেন রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে। পূর্বে বাঙালি সমাজে ঠাকুর দেবতার নামে সন্তানের নাম রাখা হত। এই প্রন্থা থেকে প্রথম বেরিয়ে আসেন রামসুন্দর। কন্যার নাম রেখেছিলেন নিরুপমা। বাঙালি সামাজে কন্যা বিবাহ দেওয়া এক রীতি। রামসুন্দরও সে ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কন্যার বিবাহ দিতে তো মোটা অংকের পণের প্রয়োজন। পাত্রপক্ষের দাবি দশ হাজার টাকা। রামসুন্দর এবারও রাজি হন। কিন্তু বিবাহ সভায় অর্থ সংগ্রহ করতে না পারলে অপমানিত হতে হয়।

শুধু পিতার অপমানেই শেষ নয়, এ অত্যাচার চলতে থাকে কন্যার ওপর। বধূর ওপর মানসিক অত্যাচার করা শাশুড়ির স্বভাব ধর্ম। সে অত্যাচার করতে শুরু করে নিরুপমার শাশুড়ি। প্রতিবেশীরা যখন বধূর প্রশংসা করেছে তখন শাশুড়ি নিন্দা করে –"শাশুড়ি ঝংকার দিয়া উঠিয়া বলে, "শ্রী তো ভারি। যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি শ্রী।" এখানেই শেষ নয়। অত্যাচারের মাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিরুপমার আদর যত্ন বন্ধ হতে শুরু করে। শাশুড়ি জানায় –"বাপ যদি পুরা দাম দিত তো মেয়ে পুরা যত্ন পাইত। সকলেই এমন ভাব দেখায় যেন বধূর এখানে কোনো অধিকার নেই।" কন্যার লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে পিতা বাড়ি বিক্রি করে অর্থ শোধ করতে চায়। কিন্তু বাড়িতে তো পুত্ররাও আছে। বাড়ি বিক্রি করলে তারা গৃহহীন হয়ে পরে। ফলে বিক্রি সম্ভব হয় না। অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে পড়তে হয় রামসুন্দরকে।

শুধু নিরুপমা নয় শ্বশুরবাড়িতে পিতাকেও অপমান সহ্য করতে হয়েছে। কেউ কথা বলেনি। সামান্য মর্যাদাটুকু দেয়নি। অথচ নিজেদের ঐতিহ্য, লোকাচার বজায় রেখেছে। বধূর মৃতদেহ দাহ করা হয়েছে চন্দনকাঠ দিয়ে। সমাজকে জানানো হয়েছে নিজেদের অর্থ গরিমা। শুধু এখানেই শেষ নয় আবার অধিক পণে পুত্রের বিবাহ ঠিক করেছেন রায়বাহাদুর। এ গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দু পণপ্রথা। সে প্রথায় বলি হতে হয়েছে নিরুপমাকে, মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে রামসুন্দর মিত্রকে। সামাজিক ছোটোগল্প হিসেবে 'দেনাপাওনা' একটি সার্থক ছোটোগল্প তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

হাস্যরস ও 'লম্বকর্ণ' গল্প

উ.- হাসি মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। পরশুরাম তাঁর গল্পে অবিরাম হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। তবে পরশুরামের হাস্যরস ব্যঙ্গপ্রধান। সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি আবিষ্কার নিমিত্তে তিনি হাসির জগতে যান। কখনও ব্যঙ্গবানে হাস্যরসের বিচ্ছুরণ ঘটান। পরশুরামের 'লম্বকর্ণ' একটি নির্মল হাস্যরসের গল্প।

গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ গল্পে হাস্যরসের ফল্গুধারা প্রবাহমান। বংশলোচন বাবু ভাত ও লুচি বর্জন করে দুই বেলা কচুরি খান। যা আমাদের হাসির জগতে নিয়ে যায়। বংশলোচনের বাড়ির যে মজলিস সেখানে নিত্য কথাবার্তায় লেখক হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। ছাগলের নাম কী রাখা হবে, এ নিয়ে নানা নাম প্রস্তাব আসে যেখানে রয়েছে হাসি। বিনোদ নানা নাম প্রস্তাব করে –'ভাসুরক' দধিমুখ' 'মসীপুচ্ছ' ও 'লম্বকর্ণ'। বংশলোচনের বাড়ির দারওয়ানের নাম চুকন্দর সিং। চুকন্দরের চেহারার যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তা হাস্যরসের জোগান দেয় –"শীর্ণ খর্বাকৃতি গালপাট্টা দাড়ি, পাকানো গোঁফ, জাঁকালো গলা এবং ততোধিক জাঁকালো নাম –ইহারই জোরে সে চোট্টা এবং ডাকুর আক্রমণ হইতে দেউড়ি রক্ষা করে।"

শুধু চুকন্দরের চেহারার বর্ণনা নয় তাঁর মুখে যে ভাষা সঞ্চার করেছেন লেখক তা হাসির সৃষ্টি করে। চুকন্দরকে মানিনী দেবী নির্দেশ দেন ছাগলকে বাইরে রেখে আসতে। কিন্তু বাবুর হুকুম ভিন্ন। বংশলোচন তাঁকে যে হুকুম করে তার বর্ণনায় রয়েছে হাসি –"দেখো চুকন্দর সিং, এই বকরি গেটের বাইরে যাগা তো তোমরা নোকরি ভি যাগা।" লম্বকর্ণকে স্থান দেন বংশলোচন। কিন্তু লম্বকর্ণের কীর্তিকলাপে হাসির সৃষ্টি হয়। লম্বকর্ণ বংশলোচনের গীতা খেয়ে ফেলে। শুধু তাই নয় –"লম্বকর্ণ তখন প্রদীপের কাছে গিয়ে রেড়ির তেল চাখিয়া দেখিল, বেশ সুস্বাদু। চকচক করিয়া সবটা খাইল। " লম্বকর্ণের এবার স্থান হয় লাটুবাবুর বাড়ি। সেখানেও সে অনিষ্ট করে। ঢোলের চামড়া, ব্যায়লার তাঁত, হারমোনিয়ার চাবি সমস্ত খেয়েছে। আবার পাঞ্জাবির পকেট কেটে লব্বই টাকার লোট খেয়েছে।

বংশলোচন লম্বকর্ণকে এবার বিদায় দিতে চেয়েছে। এজন্য পকেটে করে নিয়ে গেছে জিলাপি লম্বকর্ণের খাদ্য হিসেবে। লম্বকর্ণকে কেউ যেন বলি না দেয় সেজন্য বংশলোচন লম্বকর্ণের গলায় একটি ছোট বাক্সে একটি কাগজ রেখে দিয়েছেন। কাগজে লেখা ছিল –"আল্লা কালী যিশুর দিব্য ইহাকে কেহ মারিবেন না।" লম্বকর্ণ ফিরে এলে মালিনী দেবী লম্বকর্ণের শিং কেমিক্যাল সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছেন। এ গল্পের সম্পূর্ণ অংশ জুড়েই রয়েছে হাস্যরস। যা আমাদের আনন্দের খোরাক সৃষ্টি করে।

'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ' গল্পের নামকরণ ভাবনা

উ.- শেক্সপিয়রের কথা অনুকরণ করে –'নামে কি এসে যায়' আমরা বললেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা অচল। গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন তার সৌন্দর্যের হানি ঘটে না, একথা সত্য বটে। তবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ মন্তব্য গুরুত্বহীন। সাহিত্যের নামকরণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা নামকরণের মধ্য দিয়েই একজন পাঠক লেখার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সাহিত্যের নামকরণ বিভিন্ন দিক থেকে হতে পারে। সুবোধ ঘোষের 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ' গল্পে ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ গুরুত্ব পেয়েছে। আমরা জানি ইতিহাসে তিনটি পাণিপথের যুদ্ধ ঘটেছিল। লেখক এ ইতিবৃত্তকে চতুর্থ বলে ঘোষণা করেছেন। তথাকথিত সভ্য ভারত পরাজিত করেছে ভারতের আদিম জনজাতির মানুষকে। লেখকের মতে এ যেন 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ'।

খ্রিস্টান স্কুলে পড়ত কিছু ছাত্রছাত্রী। এখানে বাঙালি, বিহারী ও আদিবাসী ছাত্রছাত্রী ছিল। আদিবাসী ছাত্রদের ধর্মান্তরীকরণের প্রসঙ্গও ছিল। এজন্য হেডমাষ্টার ফাদার লিওন আদিবাসী ছেলেদের বিশেষ নজর দিতেন। আদিবাসী ছেলেদের মধ্যে ষ্টিফান হোরো ছিল পড়াশোনায় মেধাবী। ফাদার লিওন বুঝেছিলেন এ ছেলেকে দিয়ে কাজ হবে। কিন্তু হোরো কিছুদিনের মধ্যেই ভিন্ন স্বভাবের হয়ে ওঠে। হাঁটে গিয়ে বুড়ো সোখার সঙ্গে দেখা করে। বুড়ো সোখাই হোরোর জীবন পাল্টে দেয়। সে অরণ্যের আদিম চেতনা বুঝতে পারে। বিরসাদের আদিম অরণ্যকে কীভাবে পাল্টে দেওয়া হচ্ছে। নিজেদের জাতিচেতনার লোপ ঘটিয়ে খ্রিস্টানে পরিণত করা হচ্ছে। পাল্টে যায় হোরো। স্কুল পরিত্যাগ করে। সে হয়ে ওঠে অরণ্যের বুনো মানুষ। তবে ফাদার লিওন চেষ্টা চালিয়েছিল –"লিওন জানেন প্রতি মঙ্গলবার হাটে বুড়ো সোখা আসে। একটা অরণ্য-আত্মা প্রতিশোধ নেবার জন্য যেন আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সুযোগ খুঁজছে। চা বিস্কুট টেনিস—সুসভ্যতার এক একটি প্রসাদ খাইয়ে হোরোকে যেন পোষ মানিয়ে রাখতে চাইছিলেন ফাদার লিওন।" এ দৃশ্য ছাত্রদের কাছে মনে হয়েছে –'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ'। কিন্তু মনে সংশয় ছিল কে জিতবে ! লিওন না হোরো।

গল্পকথকরা বড়দিন উপলক্ষ্যে বনে পিকনিক করতে গিয়েছে। বনে পাখি মেরে চলছিল ষ্টিফান। গল্পকথক ষ্টিফানকে ডাক দিয়েছিল পিকনিকে আসার জন্য কিন্তু সে আসেনি। বরং একটি কাঠবিড়ালি মেরে পকেটে ঢুকিয়ে নেয়। ইন্দু তখন বলেছিল 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধে বুড়ো সোথার জয় অবধারিত'। এর কিছুদিন পরে ষ্টিফান স্কুল ছেড়ে চলে যায়। বারবার সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া ষ্টিফান এবার অনেক কম নম্বর পায়। খ্রিস্টান মাষ্টাররা ইচ্ছা করেই কম নম্বর দেন। ইচ্ছা করেই হারিয়ে দেন। বাঙালি ছাত্ররাও খুশি। তাদের মধ্যেও এক ঈর্ষা ছিল আদিবাসী ছেলে কেন বেশি নম্বর পাবে। বলা ভালো ষ্টিফানই কিন্তু বাঙালিদের জিতিয়ে দেয়। সে নিজে ইচ্ছা করেই খ্রিস্টান স্কুল ত্যাগ করতে চেয়েছিল। পরজাতির বশ্যতা স্বীকার করতে চায়নি। সে চেতনা জাগিয়ে দিয়েছিল বুড়ো সোথা। তবে বুড়ো সোথার যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়েছিল।

গল্পকথক লেপো থানার দারোগা হয়ে গেছে। একদিন বেশ কিছু বিরসাইট মুণ্ডা হাজিরা দিতে এসেছে। এর মধ্যে ছিল ষ্টিফান হোরো। কিন্তু নাম পরিবর্তন করে হয়েছে রুন্নু হোরো। গল্পকথক চিনতে পারেন। ষ্টিফান হয়ে গেছে বিরসা মুণ্ডার শিষ্য। বন তাদের। বনে অন্য কেউ খাজনা, তোলা, দখল করতে এলে তারা যুদ্ধ করে। এজন্যই জেল হয়েছিল ষ্টিফানের। গল্পকথকের মনে হয়েছিল – "গলায় একটা ভেলফলের মালা , আদুড় গা, কোমরে ছোটো একটি কাপড় জড়ান। হাতে একটা কাঁসার বালা। এক প্রাগৈতিহাসিক সজ্জার মধ্যে একজোড়া সুশানিত আধুনিক চোখ।" ষ্টিফান একক হয়ে গেছে। নিজেদের আদিম জনজীবন নিয়ে আছে। টি.ভি রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এমনকি প্রেমিকা চিরকি মুরমুও চলে গেছে। সভ্যতার সুসজ্জা থেকে সে বিদায় নিতে চায়। গল্পকথক প্রশ্ন করলে বড় লজ্জা পায়, তাড়াতাড়ি চলে যেতে যায়। গল্পকথকের মনে হয় –"একটা ভুলের স্মৃতি কিছুক্ষণের জন্য কাঁটার মতো মনের মধ্যে বিঁধছিল, হয়ত আমরাই নিরপেক্ষ থেকে চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধে ষ্টীফানকে হারিয়েছিলাম।" ইতিহাসের পাতায় চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ ঘটেনি। তবে এও এক যুদ্ধ। মানবতার অপমানের যুদ্ধ। সভ্যবেশী মানুষের তথাকথিত অসভ্যদের পরাজয়ের যুদ্ধ। তবে এও সত্য ষ্টিফান নিজের পরাজয় নিজেই ডেকে এনেছে। তাঁর মধ্যে স্বজাতি চেতনা বড় হয়ে উঠেছিল। এ গল্পের নামকরণ ব্যঞ্জনাধর্মী ও তাৎপর্যবাহী।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে' গ্রন্থের 'পূর্বকথা' প্রসঙ্গ

বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়ের ভ্রমণবৃত্তান্ত 'পথে প্রবাসে'। ইউরোপ ভ্রমণের পূর্বে বা ইউরোপে প্রবেশের পূর্বে তিনি ভারতীয় জনজীবনের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ইউরোপে প্রবেশের পূর্বে যে পথ দিয়ে তিনি ভারত থেকে পাড়ি দিচ্ছেন সেই চিত্র এঁকেছেন 'পূর্বকথা' অংশে। লেখকের ভ্রমণযাত্রা শুরু হয়েছিল শ্রাবণ মাসের এক মধ্যরাত্রিতে। তা কোন তিথি ছিল লেখকের স্মরণে নেই, তবে এটুকু স্মরণ আছে –সেদিন আকাশে চাঁদ ছিল না।

দক্ষিণ ভারতের কটক হয়ে বম্বে এবং বম্বে থেকে লণ্ডনে লেখকের যাত্রাপথ। কিন্তু কলকাতা থেকে বম্বে যেতে তিনি দুচোখ ভরে বহুকিছু দেখেছেন। সে যাত্রাপথের বিবরণ এসেছে 'পূর্বলেখ' অংশে। লেখক এ পথ সম্পর্কে নিজেই লিখেছেন –"বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে, পূর্বঘাট পর্বতমালার ধারে ধারে, চিল্কাহ্রদের কোল ঘেঁষে, গোদাবরীর বুক চিরে, হায়দরাবাদের তেপান্তরী মাঠ পেরিয়ে, পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সানু জুড়ে আমার পথ –কটক, ওয়ালটেয়ার, বেজোয়াডা, সেকেন্দ্রাবাদ, পুনা, বম্বে।" লেখক চিল্কা হ্রদে পৌঁছেছিলেন শেষ রাতে। মনে হচ্ছে যেন আলোর স্বপ্ন চারিদিকে প্রসারিত হয়ে আছে। কিন্তু প্রাবন্ধি তমাল বন দেখতে পাননি। পথের ধারে শুধু ক্ষেত। তবে এ ক্ষেত বাংলার থেকে ভিন্ন –"বাংলার মতো তরল হরিৎ নয়।" প্রকৃতির এই রুক্ষতা মানুষ পূর্ণ করে দিয়েছে নিজের বসন ভূষণ দিয়ে। প্রকৃতির একটা নিজস্ব সৌন্দর্যতা আছে। কিন্তু প্রকৃতি রুক্ষ হলে সে অভাব পূরণ করতে হয় মানুষকেই। প্রাবন্ধিকের ভাষায় –"বিধাতা যেখানে শিল্পী সাজেন না মানুষকে সেখানে শিল্পী সাজতে হয়। মেয়েরা তো রঙিন ছাড়া পরেই না, পুরুষেরাও রঙিন পরে, এমন দেখতে পেলুম।"

হায়দরাবাদের নিজামরাজ্যের পূর্ব নাম ছিল গোলকোণ্ডা। এ দেশ সুজলা সুফলা নয়। শুধু রুক্ষ প্রান্তর। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে দুই একটি পাহাড়ের গায়ে দুর্গ। জনপ্রাণী, পশুপাখি হীন এ শহর। তবে জনসংখ্যা নিতান্ত কম নয়, প্রায় দেড় কোটি। মহারাষ্ট্রও পাহাড় পর্বত বেষ্টিত রাজ্য। এখানকার নারীদের কমলতা নেই। পোশাক পরিচ্ছেদে নারী যেন পুরুষের দোসর। মহারাষ্ট্রের নারীদের দেখে মানুষের মনে একটা সম্ভ্রমবোধ জাগে। মারাঠা পুরুষরা অত্যন্ত শক্তিশালী বলে বাজারে চালু আছে। কিন্তু আপাত ভাবে লেখকের তা মনে হয়নি। মারাঠীদের তুলনায় গুজরাটীদের অর্থনৈতিক চিত্র একটু উন্নত। বম্বে শহরের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক লিখেছেন –"বম্বে শহরটার স্থিতি মহারাষ্ট্রেরই জিওগ্রাফীতে বটে, বম্বে শহরের জিওগ্রাফীতে কিন্তু মহারাষ্ট্রের স্থিতি গলির বস্তিতে আর গুজরাটের স্থিতি শড়কের চারতলায়। বাঙালী বাঘের ঘরে যেমন মাড়োয়ারী ঘোঘের বাসা, মরাঠা বাঘের ঘরে তেমনি গুজরাটী ঘোঘের বাসা।"

গুজরাটিদের প্রতি লেখকের এক পক্ষপাত আছে। সাহিত্যে গুজরাটিরা বাঙালিদের ঠিক পরেই অবস্থান। গুজরাটিরা কম পরিশ্রমী তবে বুদ্ধিতে বেশ পটু। লেখক মুগ্ধ হয়েছিলেন গুজরাটি নারীদের সৌন্দর্য দেখে। বম্বে কলকাতা শহরের থেকে আয়োতনে ছোট তবে। বম্বে বসবাসকারী মাড়োয়ারীদের রুচি কলকাতার মাড়োয়ারীদের তুলনায় অনেক উন্নত। সেখানেও তেমন শিল্প নেই। তবে বাংলার থেকে ভালো –"তবু কলকাতার নাই-শিল্পের চেয়ে বম্বের কাণা শিল্প ভালো।" লেখক ভারতবর্ষের জনজীবনের বর্ণনা এনেছেন এই অংশ। ভারতীয় বিভিন্ন জনজাতি, তাদের আহার, রুচি, সৌন্দর্যবোধ ও প্রকৃতি। সব মিলিয়ে 'পূর্বকথা' অংশে ভারতীয় জনজীবনের একটা বিরাট চিত্র ধরা পড়েছে।

সমুদ্রযাত্রা ও 'পথেপ্রবাসে' গ্রন্থ

অন্নদাশঙ্কর রায় জাহাজে করেই ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপে পাড়ি দিয়েছিলেন। আরব সাগর, লোহিত সাগর, ভূমধ্যসাগর হয়ে লন্ডনে পৌঁছেছেন। জাহাজে উঠেই বম্বে শহর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়। ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মাঝখানে লেখকের জাহাজের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরব সাগর। তখন ছিল বর্ষা ঋতু। স্বভাবতই জাহাজের অবিরাম দোলা ছিল। লেখকের ভাষায় –"ঢেউগুলো তার অনুচর হয়ে আমাদের জাহাজখানাকে যেন গলাধাক্কা দিতে দিতে তার চৌকাঠ পার করে দিতে চলেছে।" জাহাজ এমন দুলতে থাকে যে অধিকংশ যাত্রী ডেক ছেড়ে শয্যায় আশ্রয় নেন। এমনকি তিন দিন আচ্ছন্ন হয়ে কাটাতে হয়। মাঝে আর কিছু দেখা হয়নি। ক্যাবিন স্টুয়ার্ড খাবার দিয়ে যায়। খাবার পছন্দ না হলেও খেতে হয়। আসলে বাঙালি খাবার খেতে অভ্যস্থ লেখকের প্রথমে কিছুদিন অসুবিধা হয়।

ক্যাবিনে থাকতে থাকতে লেখক অসহ্য বোধ করেন। কখনও মনে হয় মৃত্যুই বুঝি শ্রেয়। জীবন –মৃত্যুর পার্থক্য লোপ পেয়ে যায়। ইউরোপ ভ্রমণের বাসনা অনেকটা লঘু হয়। মনে হয় – "সমুদ্রপীড়া যে কী দুঃসহ তা ভুক্তভোগী ছাড়া অপর কেউ ধারণ করতে পারবে না।" কিন্তু আরব সাগর থেকে লোহিত সাগরে যেতেই সমুদ্রপীড়া সহ্য হয়ে যায়। আসলে মানুষ অভ্যাসের দাস। সমুদ্রের দোলা লেখক সহ্য করে ফেলেন। এখান থেকে সমুদ্রের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে শুরু করেন। এমনকি জাহাজের ওপর মায়া শুরু হয়েছে। দেশের কথা এখন যেমন মনে পড়ছে না তেমনি কোথায় যাত্রা তাও মনে দোল খাচ্ছে না। কেবল মনের মধ্যে জাহাজ অধিকার দখল করে আছে। মনে কেবল ভেসে চলার আনন্দ –"তখন গতির আনন্দে কেবল ভেসে চলতেই ইচ্ছা করে, কোথাও থামবার বা নামবার সংকল্প দূর হয়ে যায়।" জাহাজের ক্যাবিন বেশি বড় নয়। তবে মনে হচ্ছে যেন দোলনায় শুয়ে দুলছি। ক্লান্তি অতিবাহিত হতেই লেখক ডেকে বসে কাটাতেন। বসে বসে দেখতেন চারিদিকের অসমুদ্র জলরাশিকে। তবে জলরাশি স্থির। জাহাজের আশে পাশে ছাড়া জলের ঢেউ নেই।

লোহিত সাগরের পর ভূমধ্যসাগর। তবে এ দুই সাগরের মাঝে একটি খাল আছে। যা সুয়েজ কেনাল নামে পরিচিত। দুই সমুদ্রকে এই খালই যুক্ত করেছে। সুয়েজ কেনাল ছোট নদীর মতো। কেনালের তীরেই পোর্ট সৈয়দ শহর। শহর ছেড়ে লেখক পাড়ি দেন ভূমধ্যসাগরে। এ সাগর শান্ত শিষ্ট। কিন্তু সর্বদা নয়। ফল যা হবার তাই হল। প্রথম কয়েকদিন শান্ত শিষ্ট থাকলেও পরেই আসল রূপ বেরিয়ে এল। ভূমধ্যসাগর থেকে নামলেন মার্সেলস শহরে। এ শহরকে যেন সমুদ্র ঢেকে রেখেছে। প্রাবন্ধিকের ভাষায় –"পাহাড়ের ওপর থেকে মার্সেল্‌স্‌কে দেখলে মনে হয় যেন সমুদ্র তাকে সাপের মতো সাতপাক জড়িয়ে বেঁধেছে।" এরপর প্যারিস, সেখান থেকে জলপথে ডোভার হয়ে লন্ডনে পৌঁছে যান। লেখকের লন্ডন যাত্রা সমুদ্রের মধ্য দিয়েই। যাত্রাপথের বিবিধ বর্ণনা এনেছেন। শুধু বর্ণনাই নয় তা সাহিত্য করে তুলেছেন। হয়ে উঠেছে সার্থক ভ্রমণসাহিত্য।